ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No.2212- 2224
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.484

উত্তরবঙ্গের মেচ জনজাতি: ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য

ড. পার্থ সারথী মন্ডল, *কলেজ শিক্ষক, ইংরেজি বিভাগ, লীলাবতী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 11.07.2026; Accepted: 22.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article examines the rich and evolving literary tradition of the Mech tribe, an integral branch of the Bodo-Kachari ethnolinguistic community. Although the Mech language historically lacked an indigenous script, its adoption of the Eastern Nagari (Bengali–Assamese) script has significantly contributed to its literary development. This transition has facilitated the documentation, preservation, and expansion of a wide range of literary expressions, encompassing folklore, oral histories, and contemporary belles-lettres, thereby reinforcing the cultural identity of the Mech people. Distinguished scholars and cultural leaders such as Dr. Kameswar Brahma and Subin Shoaiba have played a pivotal role in advocating for the official recognition of the Bodo language and in promoting Mech literature within the broader linguistic and literary framework of the region. This article further explores the vibrant oral literary heritage of the Mech community, which includes myths, folktales, legends, and social narratives that have historically served as repositories of collective memory, cultural values, and indigenous knowledge. Sustained efforts to document, study, and disseminate Mech literature have led to the emergence of a substantial body of written works that reflect diverse aspects of the community's social organization, religious beliefs, everyday life, and relationship with the natural environment. These literary initiatives have played a crucial role in preserving the distinctive worldview of the Mech people and fostering their cultural revitalization in the face of modernization and external socio-cultural influences. Furthermore, Mech literature embodies the community's indigenous Bathou religious tradition while simultaneously reflecting the assimilative influences of Hinduism and the Brahmo faith, thereby revealing the unique spiritual and philosophical foundations of Mech society. The ongoing growth of Mech literary activity represents a significant milestone in the preservation of cultural heritage, linguistic empowerment, and the affirmation of ethnic identity. It ensures that the language, literary traditions, and cultural legacy of this historically marginalized community are safeguarded for future generations. Ultimately, this literary renaissance not only consolidates the cultural identity of the Mech people but also enriches the diverse literary landscape of Northeast India.

Keywords: Literature, Culture, Environment, Documentation, Narrative

এই নিবন্ধটি বোরো-কাছারি জাতিগোষ্ঠীর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ 'মেচ' জনজাতির সমৃদ্ধ ও বিবর্তনশীল সাহিত্যিক ঐতিহ্যের ওপর আলোকপাত করে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মেচ ভাষার নিজস্ব কোনো লিপি না থাকলেও, পূর্ব নাগরী (বাংলা-অসমীয়া) লিপি গ্রহণের মাধ্যমে এই ভাষা উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। এই রূপান্তর লোকগাথা ও মৌখিক ইতিহাস থেকে শুরু করে সমকালীন মননশীল সাহিত্য (belles-lettres) পর্যন্ত অসংখ্য সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি ও সংরক্ষণে সহায়ক হয়েছে, যা মেচ সাংস্কৃতিক সত্তাকে আরও পরিপুষ্ট করেছে। ড. কামেশ্বর ব্রহ্ম এবং সুবিন শৈবের মতো একনিষ্ঠ পণ্ডিত ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ বোরো ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবি এবং বৃহত্তর ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে মেচ সাহিত্যের প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

নিবন্ধটিতে মেচ জনগণের প্রাণবন্ত মৌখিক ঐতিহ্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে পুরাণ, লোককথা এবং সামাজিক আখ্যান, যা ঐতিহাসিকভাবে তাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও গোষ্ঠীগত জ্ঞান বহন করে আসছে। মেচ সাহিত্য নথিবদ্ধকরণ, অধ্যয়ন ও সম্প্রসারণের এই প্রচেষ্টা এমন এক লিখিত সাহিত্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে যা সামাজিক কাঠামো, ধর্ম, দৈনন্দিন জীবন এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মতো বিষয়গুলোকে ধারণ করে। এই সাহিত্যিক উদ্যোগগুলো আধুনিকায়ন ও বাহ্যিক প্রভাবের মাঝেও এই সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র বিশ্ববীক্ষাকে টিকিয়ে রাখতে এবং তাদের সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণে সহায়তা করছে।

তদুপরি, মেচ সাহিত্য তাদের আদিবাসী 'বাথৌ' ধর্মীয় বিশ্বাস এবং হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের সমন্বিত প্রভাবের প্রতিফলন ঘটায়, যা এই জনজাতির আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভিত্তির এক অনন্য পরিচয় দেয়। বর্তমানে মেচ সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের এই বিকাশ সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা নিশ্চিত করে যে ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক এই সম্প্রদায়ের ভাষা ও ঐতিহ্য আগামী প্রজন্মের জন্য সগৌরবে টিকে থাকবে। এই সাহিত্যিক নবজাগরণ কেবল মেচ পরিচয়কেই সুসংহত করে না, বরং উত্তর-পূর্ব ভারতের বৈচিত্র্যময় সাহিত্যিক মানচিত্রকেও সমৃদ্ধ করে। ঐতিহাসিক, নৃবিজ্ঞানী এবং পণ্ডিতদের মধ্যে 'মেচ' শব্দ বা জনজাতির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ থাকলেও, তাঁরা অধিকাংশই এই বিষয়ে একমত যে মেচ জনজাতি বোরো-কাছারি গোষ্ঠীভুক্ত (যা ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জাতিগোষ্ঠীর একটি উপবিভাগ)। ভারতে মঙ্গোলয়েড বোরোদের আগমনের সঠিক সময় ও তারিখ নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। এটি যুক্তিযুক্ত যে জলবায়ু পরিবর্তন, খরা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য অমীমাংসিত জটিলতা বোরোদের আদি বাসস্থান থেকে প্রাথমিক বিচ্ছুরণ ও অভিবাসনকে ত্বরান্বিত করেছিল এবং খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সন্ধানে তারা সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দুঃসাহসী উপদলগুলো ভাগ্যান্বেষণে হিমালয় সংলগ্ন গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। এই বসতি স্থাপনকারীরা বিশাল হিমালয় অঞ্চলে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তারা এক সময়ের শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ সত্তা থেকে বর্তমানে সংখ্যালঘু তফশিলি উপজাতিতে (Scheduled Tribes) পরিণত হয়েছে।

নগেন্দ্রনাথ বসু, গ্রিয়ারসন প্রমুখের মতে, 'মেচ' শব্দটি সংস্কৃত 'ম্লেচ্ছ' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ অপবিত্র বা অশুচি; অন্যদিকে একদল পণ্ডিতের অভিমত যে, এই জনগোষ্ঠীর কিছু পূর্বপুরুষ মেচি নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতেন এবং ফলস্বরূপ তাঁদের নাম 'মেচ' হয়েছে। ডালটন, হজসন, ড. ফ্রান্সিস বুকানন-হামিল্টন, গ্রিয়ারসন প্রমুখ গবেষক ও পণ্ডিতদের মতে— মেচ, কোচ, রাজবংশী, রাভা, গারো, কাছারি এই মানব উপগোষ্ঠীগুলো মূলত বোরো জনজাতিরই অন্তর্ভুক্ত। আলিপুরদুয়ার জেলার মেচ জনজাতি নিজেদের 'বোরো' হিসেবে পরিচয় দিতে অভ্যস্ত। তবে এটি বাস্তব যে, অসমের বোরো জনজাতি উত্তরবঙ্গের মেচ

সম্প্রদায়কে 'বির্দান আরি' (Birdan Ari) নামে অভিহিত করে, বিপরীতে উত্তরবঙ্গের মেচ জনজাতি অসমের বোরোদের 'সামজারি' (Samjari) বলে সম্বোধন করে।

মেচ জনজাতির উৎপত্তি নিয়ে অনেক যুক্তি-পাল্টা যুক্তি, জনপ্রিয় তত্ত্ব এবং কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। স্যার হার্বার্ট হোপ রিজলি এবং নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁদের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন— মেচদের সম্ভাব্য বাসস্থানের সন্ধানে ঈশ্বর কর্তৃক তিন ভাইকে বারাণসীতে পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং এরপর পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন এবং কাছাড় নামক পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের কোশী ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী পলিমাটি সমৃদ্ধ সংযোগস্থলে এসে পৌঁছান। কনিষ্ঠ ভাই সেখানে বসতি স্থাপন করেন এবং কালক্রমে তাঁর উত্তরসূরিরা মেচ নামে পরিচিত হন। অন্যদিকে, বাকি দুই ভাই আরও এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং নেপালে পৌঁছান— তাঁদের উত্তরসূরিরা 'লিম্বু' এবং 'খাম্বি' নামে পরিচিত হন। প্রথিতযশা পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ চারুচন্দ্র সান্যাল ১৯৬৯ সালে আলিপুরদুয়ার জেলার সাতালির মেচ পুরোহিত ব্রজনাথ শৈবের কাছ থেকে মেচ জনজাতির উৎপত্তি সংক্রান্ত একটি লোককথা সংগ্রহ করেন। এই কিংবদন্তি অনুসারে, লিম্বু এবং মেচেরা একত্রে বসবাস করতেন; তাঁরা সম্ভবত তিব্বতি-বর্মি অঞ্চল অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত থেকে চীনা বাহিনীর দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিলেন। সময়ের সাথে সাথে তাঁরা তরাই অঞ্চলের ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর পালিয়ে আসেন। সেখানে তাঁরা বসবাস শুরু করেন এবং খাদ্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করেন। লিম্বুরা খাদ্য উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করেন এবং যখন তাঁদের খাদ্যভাণ্ডার দ্রুত শেষ হতে শুরু করে, তখন তাঁরা পার্বত্য অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। মেচ সম্প্রদায় এই ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে ছিল এবং তাঁরা লিম্বুদের অনুসরণ করার চেষ্টা করলেও পথ হারিয়ে মেচি নদীর (মহানন্দা নদীর একটি উপনদী) তীরে চলে আসেন। একটি দল মেচি নদীর তীরেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারা 'মেচ' নামে পরিচিত হয়, অন্যদিকে কেউ কেউ পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিশাল বোরো-গোষ্ঠীর অগণিত সদস্যরা ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের কারণে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন নামে পরিচিত— উত্তরবঙ্গ ও নেপাল থেকে কাশ্মীর উপত্যকা পর্যন্ত বসতি স্থাপনকারীরা মেচি নদী অনুসারে 'মেচ' বা 'মেচে' নামে পরিচিত; সংকোশ ও পূর্ব ব্রহ্মপুত্র থেকে বরাক উপত্যকা অঞ্চলের অধিবাসীরা 'বোরো' হিসেবে শ্রেণিভুক্ত; কাছাড়ের পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দারা 'বোরো-কাছারি' গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত এবং ডিমাপুরের বাসিন্দারা 'ডিমাসাবোরো' নামে পরিচিত। ভারতীয় নৃবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁর 'History of Bengal'-এ উল্লেখ করেছেন যে, দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উত্তরবঙ্গ কম্বোজদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল এবং তাদের উত্তরসূরিরাই কোচ, পানিয়া ও মেচ নামে পরিচিত হয়। মেচ শব্দের বা জনজাতির উৎপত্তি নিয়ে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এক দুরূহ কাজ এবং এই রহস্য সমাধানের চ্যালেঞ্জ কেবল শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরাই গ্রহণ করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মেচ জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় করা বর্তমানে অসম্ভব, কারণ ১৯৮১ সালের পর থেকে অদ্যাবধি জাতিভিত্তিক বা ধর্মভিত্তিক কোনো আদমশুমারি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। তবে এটি যুক্তিযুক্ত যে, মেচ জনবসতি মূলত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত এবং নবগঠিত আলিপুরদুয়ার জেলায় তাদের জনসংখ্যার হার সর্বাধিক। মেচ সাহিত্যিকদের বিদগ্ধ সমাজ (crème de la crème) তাঁদের সমৃদ্ধ ভাষাকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন— যদিও মেচ জনজাতির নিজস্ব কোনো লিপি নেই, তবুও তাঁদের ভাষা অসংখ্য মননশীল সাহিত্য (belles-lettres) ও সাহিত্যরত্নের জন্ম দিয়েছে। বর্তমানে, পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদগণ পূর্ব নাগরী (বাংলা-অসমীয়া লিপি হিসেবেও পরিচিত) লিপির সাহায্যে মেচ সাহিত্যের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছু বুদ্ধিজীবীর মতে, প্রাচীন মেচ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'দেওধাই' (Deodhai) নামক

একটি লিপির প্রচলন ছিল। বোরো সাহিত্য সভার সভাপতি ড. কামেশ্বর ব্রহ্ম এবং তাঁর প্রধান সহযোগী (Man Friday) সুবিন শৈব (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক) বোরো ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবি আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন— তাঁরা দুজনেই বোরো ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারে অভূতপূর্ব জনঅংশগ্রহণের জোয়ার সৃষ্টি করেছেন।

মেচ সমাজ মূলত সমতাভিত্তিক এবং এখানে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই। এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ লিঙ্গবৈষম্যে বিশ্বাসী নয়, তবে এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে মেচ জনজাতির সামাজিক-ধর্মীয় কাঠামো পাঁচটি গোত্র বা 'আরি'-তে (Aris/Relationship group, যা বংশলতিকার সমার্থক হিসেবে বিবেচিত) বিভক্ত। এই গোত্রগুলো হলো: নার্জিনারী (পাতা গোত্র), ঈশ্বরারী (দেব গোত্র), বসুমাতারী (ভূমি গোত্র), হাজোয়ারী (পাহাড় গোত্র) এবং মোশারী (বাঘ গোত্র)। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার জেলার সাতালিতে মেচ পুরোহিত ব্রজনাথ শৈবের কাছ থেকে প্রথিতযশা পণ্ডিত ড. চারুচন্দ্র সান্যালের সংগৃহীত একটি লোককথা অনুযায়ী দাবি করা যেতে পারে যে, মেচ সম্প্রদায় সাতটি গোত্রে বিভক্ত। এই কিংবদন্তি অনুসারে, একদল মেচ মানুষ তাঁদের স্থায়ী বাসস্থানের সন্ধানে বনের এক বিশাল গাছের নিচে এসে উপস্থিত হন। ফলস্বরূপ, তাঁরা এলাকাটিকে বসবাসের উপযোগী করার জন্য গাছটি কাটার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁদের একটি দল গাছ কাটতে শুরু করে এবং অন্য দলটি রান্নার প্রস্তুতি নিতে থাকে। গাছটি যখন পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন গাছ কাটার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা অন্যদের আঘাত এড়াতে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে বলেন। যারা এই অর্ধেক রান্না করা খাবার (মেচ ভাষায় যাকে 'সাম্প্রাস' বা 'চাম্প্রাস' বলা হয়) খেয়েছিলেন এবং নিরাপত্তার খাতিরে ওই গাছের নিচে থাকার সাহস দেখিয়েছিলেন, তাঁদের গোত্র 'সাম্প্রাসারী' বা 'চাম্প্রামারী' নামে পরিচিত হয়। যারা 'নারজাই' (Narjai) গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন (পাটের সমগোত্রীয় এক বিশেষ গাছ), তাঁরা 'নার্জিনারী' (নারজেন + আরি) নামে পরিচিত হন। একইভাবে, যারা ভূগর্ভস্থ বা মাটির নিচে আশ্রয় খুঁজেছিলেন তাঁরা 'বসুমাতারী' (বসুমাতা + আরি), যারা অকুতোভয় চিত্তে গাছের নিচে থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা 'বারগাঁও-আরি' (বারগাঁও + আরি) এবং সবশেষে যারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নাম জপ করে সেখানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা 'ঈশ্বরারী' (ঈশ্বর + আরি) নামে পরিচিত হন। যারা নিকটবর্তী বনে পালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা 'হাজোয়ারী' (হাজো + আরি) এবং মেচদের যে দলটি বাঘ সমৃদ্ধ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের দিকে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা 'মোশারী' বা 'মোশাহারি' (মোশা + আরি) নামে চিহ্নিত হন। সব মেচ বুদ্ধিজীবী এই গোত্র-বিভাগের সাথে একমত না হলেও, এটি অনস্বীকার্য যে মেচ সমাজে এই গোত্রনামগুলোই পদবি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সম্ভবত ঈশ্বরারী ও চাম্প্রামারী গোত্রগুলো যথাক্রমে বারগাঁও-আরি ও বসুমাতারী গোত্রেরই সমার্থক। এই দ্বৈত বিভাজন ছাড়াও, স্থানীয় পর্যায়ে মেচদের গোত্র পেশার ভিত্তিতেও বিভক্ত হতে পারে— 'মন্ডল' গোত্র এর একটি অন্যতম উদাহরণ হতে পারে।

মেচ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসে মূর্তিপূজা বা উপাসনালয়ের কোনো উল্লেখ নেই, যা হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম রূপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অনাদিকাল থেকে তাঁরা পৃথিবী-কেন্দ্রিক ধর্ম বা প্রকৃতি পূজার অনুশীলন করে আসছেন, যা 'বাথৌ' (Bathouism) নামে পরিচিত। বলা যেতে পারে যে, বাথৌ ধর্মীয় বিশ্বাস এই পৃথিবীতে বোরো গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতিদের জন্মের সাথেই প্রাক-যৌক্তিকভাবে (protologically) উদ্ভূত হয়েছিল। এই প্রাচীন ধর্মীয় অনুশীলনের মূল ভিত্তি হলো 'পঞ্চভূত' (পাঁচটি প্রধান উপাদান যা সমস্ত জীবের মৌলিক কাঠামোগত ভিত্তি তৈরি করে)— বোরো ভাষায় 'বাথৌ' শব্দের অর্থ হলো পাঁচটি নীতি ('বা' মানে পাঁচ এবং 'থৌ' মানে গভীর)। এই পাঁচটি নীতি বা উপাদান হলো: বার (বায়ু), অর (অগ্নি), হা (ক্ষিতি/মাটি), দ্বৈ (জল) এবং ওখরাং (ব্যোম/আকাশ):

"থাইগিরনি বিখঙা খঙবা, (ওউ ফলের পাঁচটি খোসা আছে)
সিজৌনি সিরিয়া সিরিবা, (সিজৌ গাছের পাঁচটি খাঁজ আছে)
সিফুংনি গুদুঙা দুঙবা, (সিফুং বা বোরোদের দীর্ঘ বাঁশের বাঁশিতে পাঁচটি ছিদ্র আছে)
বাথৌনি বান্দুয়া বান্দুবা, (বাথৌ-এর বাঁশের কঞ্চিতে পাঁচটি গিঁট আছে)
বোরো বোরয়িনি রাওয়া ফঙবা (বোরো মুরুব্বিদের পাঁচটি নৈতিক উপদেশ আছে)"[১]

উপরোক্ত কবিতাটি ড. শেখর ব্রহ্মের যুগান্তকারী গ্রন্থ 'Religion of the Bodos and their Socio-Cultural Transition: A Historical Perspective' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই পাঁচটি উপাদান মানবদেহের শারীরিক ও প্রাণশক্তি এবং বস্তুগত জগতের সাথে সম্পর্কিত। পঞ্চভূত মানুষের সামগ্রিক সুস্থতার প্রতিফলন ঘটায়। মানবদেহে যে কোনো ব্যাধি মূলত এই উপাদানগুলোর এক বা একাধিকের ভারসাম্যহীনতাকে নির্দেশ করে। বোরোদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত দিকগুলোতে পঞ্চভূতের এক চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়— এমনকি প্রথাগত বোরো নৃত্যশৈলীর পঞ্চমুদ্রার (অঙ্গুষ্ঠ বা বৃদ্ধাঙ্গুলি-অগ্নি; তর্জনী-বায়ু; মধ্যমা-মহাকাশ বা শূন্য; অনামিকা-ক্ষিতি বা মাটি এবং কনিষ্ঠা-জল) এক স্পষ্ট ছাপ বহন করে। রঞ্জন ঘোষ তাঁর উচ্চমানের গবেষণামূলক নিবন্ধ "Imagination, Imaging, and Revisionist Aesthetics in Rushdie's 'Haroun and the Sea of Stories': An (In)fusionist Approach"-এ (যা পেন স্টেট ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত) পর্যবেক্ষণ করেছেন:

> "ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও রসতত্ত্বের পরিধিতে 'অভিনয়' একটি অত্যন্ত জটিল রূপক। মুদ্রার আঙ্গিক অভিনয় (শরীরের ভাষা) নিজস্ব শব্দভাণ্ডার ও অনুরণন তৈরি করে।"[২]

অধ্যাপক ঘোষের এই মহৎ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রচেষ্টার সাথে তাল মিলিয়ে আমি আরও বলতে চাই যে, অভিনয়ের জন্য 'তপস্যা'র (সংযমের ধ্যান) শৈল্পিক ও একনিষ্ঠ আলিঙ্গন প্রয়োজন, যা শেষ পর্যন্ত শিল্পীর মহৎ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এটি 'res cogitans' (চিন্তাশীল সত্তা বা মন) এবং 'res extensa' (বিস্তৃত সত্তা বা শরীর) অণুগুলোর এক মেলবন্ধন ঘটায়। শিল্পীর এই 'ipseity' বা স্বকীয়তা তাঁকে এক সর্বব্যাপী প্রোমিথিউস-সদৃশ যন্ত্রকুশলীতে রূপান্তরিত করে, যেখানে তাঁর ক্লান্তিহীন উদ্দীপনার মধ্যে মিশে থাকে 'লীলা' (আনন্দময় শক্তির প্রবাহ), রাবীন্দ্রিক 'friluftsliv' (মুক্তাঙ্গন জীবন), 'শান্ত রস' (শান্তি ও প্রশান্তির রস)। শিল্পীর এই 'système allocutoire' বা জাতির প্রতি সম্বোধন বাখতিনের 'heteroglossia' (ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠস্বর ও বিবিধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মিশ্রণ) উদযাপন করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, শিল্পীর এই 'mise en abyme' (প্রতিনিধিত্বের এক প্রকার দর্পণ চিত্র) এক বহুত্ববাদী সমাজের ousia বা সারসত্তাকে জয়যুক্ত করে, যা ক্ষমতা কাঠামোর প্রান্তিক, অবহেলিত ও বহিষ্কৃত কণ্ঠস্বরগুলোর মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে। বোরোরা বিশ্বাস করতে পছন্দ করেন যে মানবদেহ একটি জটিল সামগ্রিকতা এবং এটি পাঁচটি অপরিহার্য উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত; এই বিশ্বাসের কারণে তাঁরা নিজেদের 'বাডোসা' বা 'সাবা মিদাইনি ফিসা' বা 'বোরোফিসা' (অর্থাৎ পাঁচটি মূল উপাদানের গঠন) বলে ডাকতে পছন্দ করেন। ধারণা করা হয় যে, 'বাডোসা' শব্দটি 'বোরো' এবং 'বরো' শব্দ দুটিরই একটি রূপান্তরিত রূপ।

সাহিত্য পর্যালোচনা:

মূল নিবন্ধে মেচ জনজাতি সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনা করলে ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক অধ্যয়নের এক বহুমুখী সংযোগ উন্মোচিত হয়। মেচ পরিচয় বোঝার মূল চাবিকাঠি হলো বৃহত্তর বোরো-কাছারি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের অবস্থানকে স্বীকৃতি দেওয়া, যা নিজেই বিশাল ইন্দো-মঙ্গোলয়েড পরিবারের একটি উপবিভাগ। ঔপনিবেশিক যুগের নৃতাত্ত্বিক যেমন হার্বার্ট হোপ রিজলি এবং নগেন্দ্রনাথ বসুর

প্রাথমিক কাজগুলো মেচদের উৎপত্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে, যেখানে তাঁরা মেচ শব্দের সাথে সংস্কৃত 'ম্লেচ্ছ' এবং ভৌগোলিক দিক থেকে মেচি নদীর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এই প্রাথমিক ব্যাখ্যাগুলো প্রভাবশালী হলেও পরবর্তীকালের পণ্ডিতদের দ্বারা সমালোচিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে, যাঁরা সম্প্রদায়ের নিজস্ব মৌখিক ঐতিহ্য এবং অভিবাসনের ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে আরও সূক্ষ্ম ও গভীর উপলব্ধির কথা বলেছেন।

জর্জ এ. গ্রিয়ারসন, ফ্রান্সিস বুকানন-হামিল্টন এবং ব্রায়ান হজসনের মতো গবেষকদের দ্বারা নৃতাত্ত্বিক এবং জাতি-ভাষাতাত্ত্বিক দিকগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে রূপায়িত হয়েছে। তাঁরা সম্মিলিতভাবে বোরো ছত্রছায়ায় মেচদের সাথে রাভা, কোচ এবং গারোদের অবস্থান নির্ণয় করেছেন। তাঁদের ভাষাতাত্ত্বিক জরিপগুলো তিব্বতি-বর্মি পরিবারের অংশ হিসেবে মেচ ভাষার বিবর্তনকে অনুসরণ করে এবং কোনো নিজস্ব লিপি না থাকার ফলে সাহিত্যিক প্রকাশের সুবিধার্থে সমকালীন পূর্ব নাগরী লিপি গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করে। বিশেষ করে, ড. কামেশ্বর ব্রহ্ম এবং সুবিন শৈবের মতো সমকালীন পণ্ডিত ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির আন্দোলনের মাধ্যমে মেচ ভাষা ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, যা মেচদের কেবল মৌখিক ঐতিহ্য থেকে লিখিত সাহিত্যের দিকে উত্তরণের এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

ধর্মীয় অধ্যয়ন মেচ আধ্যাত্মিকতাকে বাথৌ ধর্মের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করে— যা প্রকৃতি পূজা, মহাজাগতিক উপাদান এবং নৈতিক দর্শনের ওপর গুরুত্বারোপকারী একটি পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্বাস। বাথৌ ধর্মের ওপর রচিত সাহিত্য, যার মধ্যে শেখর ব্রহ্মের কাজ এবং সৃষ্টি বি দত্তের নৃতাত্ত্বিক নথিগুলো অন্তর্ভুক্ত, এর সমন্বয়বাদী দিকগুলোকে তুলে ধরে। এখানে আদিবাসী আচার-অনুষ্ঠানের সাথে হিন্দু শৈব ও শাক্ত ঐতিহ্যের পাশাপাশি নাথ পন্থী মঠধারী আন্দোলনের প্রভাবের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। খেরাই উৎসবের মতো আচারগুলোর সংকলন এবং উদযাপন প্রায়শই সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা এবং সামাজিক সংহতির নিরিখে আলোচিত হয়, যা আচার-অনুষ্ঠান অধ্যয়ন (ritual studies) এবং সামাজিক-ধর্মীয় নৃবিজ্ঞানের সমৃদ্ধ বিষয় হিসেবে কাজ করে।

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধ্যয়নগুলো মেচদের প্রথাগত ঝুম চাষ এবং বনজ সম্পদ সংগ্রহ থেকে স্থায়ী কৃষি ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের দিকে উত্তরণের চিত্র তুলে ধরে। কালিচরণ ব্রহ্মের মতো সম্প্রদায় নেতাদের ইতিহাস এবং দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম মন্ডলের মতো সদস্যদের নির্বাচনী সাফল্যের রেকর্ড স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে এই সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততাকে নথিবদ্ধ করে। এই রাজনৈতিক আখ্যানগুলো সেই আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জগুলোকে চিহ্নিত করে, যা মেচ সম্প্রদায়ের জীবিকা ও আকাঙ্ক্ষাকে নতুন রূপ দিয়েছে।

চারুচন্দ্র সান্যাল এবং অন্যান্য নৃতাত্ত্বিকদের দ্বারা সংকলিত লোকগাথা, মৌখিক আখ্যান এবং পৌরাণিক কাহিনীগুলো মেচ পরিচয় টিকিয়ে রাখার এক অত্যাবশ্যক ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। পূর্বপুরুষদের অভিবাসন, বংশের উৎপত্তি বা দেবদেবীর আরাধনা— এই গল্পগুলো সাংস্কৃতিক পাঠ্য (cultural texts) হিসেবে কাজ করে যা সৃজনশীলতা ও প্রতীকী সমৃদ্ধির মাধ্যমে ইতিহাস, পরিচয় এবং নৈতিকতাকে তুলে ধরে। এগুলো সাহিত্যিক অধ্যয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা আদিবাসী গল্প বলার শৈলী, বিষয়বস্তু এবং পরিবেশনার ওপর আলোকপাত করে।

সামগ্রিকভাবে, নিবন্ধটিতে মেচ জনজাতি সম্পর্কিত সাহিত্যের যে পর্যালোচনা করা হয়েছে তা এক প্রাণবন্ত ও বহুমাত্রিক চিত্র তুলে ধরে। এটি ঐতিহাসিক বিবরণগুলোর সাথে আদিবাসী জ্ঞানের সমন্বয় সাধন, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ এবং মেচ পরিচয় টিকিয়ে রাখা সামাজিক-ধর্মীয় ব্যবস্থাগুলো বোঝার জন্য চলমান পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দেয়। ভবিষ্যতের গবেষণার পথ গভীর নৃতাত্ত্বিক সম্পৃক্ততা, আন্তঃবিভাগীয় পদ্ধতি

এবং মেচ বুদ্ধিজীবীদের সাথে সক্রিয় সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে, যাতে এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সংরক্ষিত হয় এবং একইসাথে গতিশীলভাবে বিবর্তিত হয়।

গবেষণাপত্র রচনার পদ্ধতি:

মেচ জনজাতি সম্পর্কিত মূল নিবন্ধটিতে যে গবেষণাপত্র রচনার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, তা মূলত একটি বহুমুখী ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এতে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্রসমীক্ষা (fieldwork), ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়ন এবং সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের এক মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে। মেচ জনগণের উৎপত্তি, সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম এবং আর্থ-সামাজিক জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার জন্য এই নিবন্ধে প্রাথমিক ও গৌণ— উভয় প্রকার উৎসের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছে।

ঐতিহাসিকভাবে, এই গবেষণাটি আর্কাইভাল ডেটা (আর্কাইভের তথ্য), ঔপনিবেশিক আমলের নৃতাত্ত্বিক বিবরণ এবং নগেন্দ্রনাথ বসু, হার্বার্ট হোপ রিজলি, জর্জ এ. গ্রিয়ারসন ও ফ্রান্সিস বুকানন-হামিল্টনের মতো আদি পণ্ডিতদের ধ্রুপদী গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে। এই উৎসগুলো মেচ জনজাতির অভিবাসন, ভাষাগত সম্পর্ক এবং প্রতিবেশী গোষ্ঠীগুলোর সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়ার প্রামাণ্য নথি প্রদান করে। ঐতিহাসিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে চারুচন্দ্র সান্যালের মতো পণ্ডিতদের দ্বারা সংকলিত কিংবদন্তি এবং মৌখিক ঐতিহ্যগুলোকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে লোকগাথাগুলোকে গবেষণার একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে, নিবন্ধটি মেচ সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের প্রতিফলন ঘটায়। এর মধ্যে প্রবীণ ব্যক্তি, ব্রজনাথ শৈবের মতো পুরোহিত এবং সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই গুণগত তথ্য (qualitative data) মেচদের সামাজিক সংগঠন, গোত্র প্রথা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং খেরাই-এর মতো উৎসবগুলো সম্পর্কে গভীর ধারণা দেয়। মৌখিক ইতিহাস, আচারের বর্ণনা এবং সামাজিক রীতিনীতিগুলো এই অনুসন্ধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা আদিবাসী জ্ঞানতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে একটি 'এমিক' (emic— গোষ্ঠীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি) প্রেক্ষিত তৈরি করে।

ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মেচ ভাষার বিবর্তনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে মূলত মৌখিক রূপ থেকে পূর্ব নাগরী লিপির মাধ্যমে সাহিত্যিক অভিব্যক্তিতে উত্তরণের পর্যায়গুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। এই গবেষণায় বিশিষ্ট ভাষা-কর্মী ও পণ্ডিতদের অবদান, লিপির বিকাশ, সাহিত্য উৎপাদন এবং ভাষা নীতি সংক্রান্ত আন্দোলনের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পদ্ধতি ব্যবহার করে অন্বেষণ করা হয়েছে। নিবন্ধটি বাথৌ ধর্মকে বৃহত্তর ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের সমান্তরালে স্থাপন করে এর আচারের প্রতীকীবাদ, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং সমন্বয়বাদী বিবর্তনকে মূল্যায়ন করেছে। এর মধ্যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, নৃত্যশৈলী এবং উপাসনার রীতিগুলোর বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে, এই গবেষণা পদ্ধতিটি গুণগত (qualitative), বর্ণনামূলক (descriptive) এবং ব্যাখ্যামূলক (interpretive)। এটি একদিকে যেমন গৌণ সাহিত্যের পর্যালোচনার ওপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে মেচদের জীবন থেকে প্রাপ্ত সরাসরি সাংস্কৃতিক তথ্য এবং মৌখিক সাক্ষ্যের মাধ্যমে পরিপুষ্ট। এটি একাডেমিক সূক্ষ্মতা এবং সাংস্কৃতিক বিশুদ্ধতার ভারসাম্য বজায় রেখে মেচ জনজাতির একটি সামগ্রিক ও সূক্ষ্ম চিত্র তুলে ধরেছে।

তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা:

বোরো বা মেচ ধর্মীয় তত্ত্ব অনুযায়ী, মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য 'ওবং' (Obong)-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ওবং হলেন পাঁচটি মৌলিক উপাদানের স্রষ্টা এবং ঈশ্বরের নিরাকার অস্তিত্বের প্রতীক। ধ্বনিগতভাবে, 'ওবং' শব্দটি

'ওঁ' (যাকে মহাবিশ্বের আদি ধ্বনি বলা হয়) এবং 'পরম ব্রহ্ম' শব্দের সাথে এক অদ্ভুত সুরম্য ঐকতান তৈরি করে। এই বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে যে, 'ওঁ' শব্দটি কি ওবং শব্দেরই একটি রূপান্তরিত রূপ? প্রাচীন মেচ পুরাণ ও কিংবদন্তি অনুসারে, যখন শাশ্বত দিব্য সত্তা অর্থাৎ ওবং সৃষ্টির আনন্দে মেতে ওঠেন, তখনই মহাবিশ্বের আদি ধ্বনি 'ওঁ' সঞ্চারিত হয়।

বাথৌ ধর্মের সনাতন অনুসারীরা মহাবিশ্বের স্রষ্টা বা 'জগতপিতা ও জগতমাতা'র আরাধনা করেন। এই ধর্মীয় মতবাদের দার্শনিক ভিত্তি ভারতীয় দর্শনের 'সাংখ্য' মতবাদের (পুরুষ-প্রকৃতি বা অর্ধনারীশ্বর তত্ত্ব) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার যোগশাস্ত্রের প্রেক্ষাপটে এটি শৈব ও শক্তি সাধনার সমান্তরাল। ভারতে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত নাথ হিন্দু সন্ন্যাসী আন্দোলনের আদর্শের সাথেও বাথৌ ধর্মের গভীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ এবং প্রকৃতির 'উর্বরতা শক্তি'র (fertility cult) পূজা তাঁদের প্রথাগত শামানবাদী (Shamanistic) বিশ্বাসের পরিচয় দেয়। এই দুই চিন্তাধারার সমন্বিত অনুসন্ধান একটি নতুন আদর্শিক পরিকাঠামো তৈরি করতে পারে।

মেচ সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ দেবতা হলেন 'বাথৌ'। সৃষ্টি বি দত্ত তাঁর "Explained: What is Bathou, the Religion of the Bodos in Assam" শীর্ষক নিবন্ধে পর্যবেক্ষণ করেছেন:

> "তাত্ত্বিক গ্রন্থের অভাব, মূর্তিপূজার অনুপস্থিতি এবং লিখিত ইতিহাসের অভাব সত্ত্বেও—মৌখিক সাহিত্য এবং পৌরাণিক কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে এটি শতাব্দীকাল ধরে টিকে আছে। এটিই হলো বাথৌ, যা অসমের বোরো সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম। ভারতের বৈচিত্র্যের কোনো অভাব নেই এবং স্বল্প পরিচিত বাথৌ ধর্ম তারই প্রমাণ দেয়। বোরোরা তিব্বতি-বর্মি ভাষাভাষী একটি গোষ্ঠী এবং তারা অসমের বৃহত্তম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বোরোদের মধ্যে কাছারি, রাভা, গারো ও মেচের মতো অনেকগুলো উপজাতি রয়েছে। রাজ্যের বাকি অংশের তুলনায় তাদের সংস্কৃতি, খাদ্য ও রীতিনীতি স্বতন্ত্র। বোরোরা উত্তর-পূর্ব ভারতসহ নেপাল ও বাংলাদেশেও ছড়িয়ে আছে, তবে অসমের কোকরাঝাড়, চিরাং, বাকসা এবং উদালগুড়ি জেলায় তাদের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি।"[৩]

বাথৌ ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু হলো 'সিজৌ' গাছ (Euphorbia genus), যা একটি বেদিতে স্থাপন করে পরমেশ্বরের চূড়ান্ত প্রতীক হিসেবে পূজা করা হয়। এই দেশীয় দেবতা সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের (অস্তিত্বের অন্তহীন চক্র) প্রতীক। মেচ জনজাতি দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিশেষ বাথৌ পূজার আয়োজন করে। অন্যদিকে, মেচেরা চার প্রকারের 'খেরাই' উৎসব পালন করে:

১. দর্শন খেরাই: সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ধনদেবী মাইনৌ (Mainao)-কে সন্তুষ্ট করতে পালিত হয়।
২. উমরাও খেরাই: জুন-জুলাই মাসে গ্রামবাসীর মঙ্গল এবং গ্রীষ্মকালীন ফসলের উন্নতির কামনায় পালিত হয়।
৩. ফালো খেরাই: জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ভোগালী বিহু চলাকালীন পালিত হয়।
৪. নওয়াওনি খেরাই:পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের কল্যাণে কোনো পরিবারে মাঝেমধ্যে পালিত হয়।

এটি উল্লেখযোগ্য যে, 'দৌদিনি' (Doudini/মহিলা পুরোহিত)-এর অনুপস্থিতিতে কোনো খেরাই উৎসব সম্পন্ন করা যায় না। এছাড়া বোরোরা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী, যার ফলে অনেক বোরো নারী হিন্দু দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও শিব চতুর্দশীর মতো উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বোরো সমাজে নারীদের এই উৎসব পালনে কোনো বাধা নেই। বোরো সমাজের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ দেবী হলেন মাইনৌ, যিনি বাথৌব্রাই-এর স্ত্রী এবং ধানক্ষেতের রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে বিবেচিত হন। বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণটি 'বাথৌশালী'র (পবিত্র উপাসনা স্থল)

জন্য সংরক্ষিত থাকে। বিশ্বাস করা হয় যে, উত্তর-পূর্ব কোণ পরিবারের কল্যাণ, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে। একটি সাধারণ বাথৌশালীতে মাটি দিয়ে বেদি তৈরি করা হয় এবং বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা হয়। এই বেদিটি প্রায় ১০০ সেমি উঁচু এবং ৭৫ সেমি চওড়া হয়। প্রথা অনুযায়ী বেদির মাঝখানে একটি সিজৌ গাছ রোপণ করা হয়। এরপর একটি বাঁশ থেকে পাঁচটি ফালি এবং ১৬টি খুঁটি তৈরি করে বেদিটি ঘেরা হয়।

রান্নাঘরের (esing no) ভেতরেও দেবী মাইনাত্তর জন্য একটি বেদি থাকে যা 'মাইনাত্ত বিন্দো' নামে পরিচিত। এর উত্তর দিকে কাঁচা চাল জমা রাখার জন্য একটি মাটির পাত্র (maihwndw) রাখা হয়। সিজৌ গাছটি প্রাকৃতিকভাবেই পাঁচটি খাঁজ (Siri) এবং প্রচুর জোড়ায় জোড়ায় কাঁটা নিয়ে বেড়ে ওঠে। সিজৌ গাছের এই পাঁচটি খাঁজ বার্গসঁর 'élan vital' (প্রাণশক্তি বা জীবনাবেগ) মূলনীতির প্রতীক, যা বাথৌ ধর্মের পাঁচটি দার্শনিক মতবাদ বা মহাবিশ্বের পাঁচটি মৌলিক উপাদানকে (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) নির্দেশ করে। ফরাসি দার্শনিক অঁরি বার্গসঁ তাঁর 'Creative Evolution' (১৯০৭) গ্রন্থে 'Élan vital' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সিজৌ গাছের জোড়া কাঁটা স্বামী ও স্ত্রীর আজীবনের সম্পর্কের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

মেচদের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যাভ্যাস হিন্দুদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ— মূলত তাঁরা সবুজ শাকসবজির পাশাপাশি আমিষ খাবারও পছন্দ করেন। মেচেরা দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী ব্যবহার করেন। সময়ের সাথে সাথে তাঁদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এসেছে এবং তাঁরা ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট (দুগ্ধশর্করা অসহিষ্ণু) অবস্থা থেকে দুগ্ধপ্রিয় গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। মেচদের সুপারির প্রতি বিশেষ টান রয়েছে এবং তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় পানীয় হলো 'জাউ' (Zau) বা 'জুমাই' (Zumai), যা এক প্রকার চালের বিয়ার। চালকে দুই-তিন দিন ভিজিয়ে রেখে এটি তৈরি করা হয়। এছাড়া জাউ ছেঁকে এক ধরণের স্বচ্ছ ও তীব্র গন্ধযুক্ত মদ্য তৈরি করা হয় যা ইউরোপীয় হুইস্কির মতো শক্তিশালী। গবেষকদের মতে, মেচেরা প্রাচীনকাল থেকেই এই পানীয়কে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। এতে বোঝা যায় যে, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র বা তাবিজ-কবজের মতো কুসংস্কারের বদলে মেচদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভেষজ চিকিৎসার প্রচলন আদিম কাল থেকেই ছিল। মেচদের এই ভেষজ জ্ঞান ও খাদ্যাভ্যাস সঠিকভাবে অধ্যয়ন করলে তা মানবজাতির প্রভূত কল্যাণে আসতে পারে।

মেচ সমাজে প্রথাগত বিবাহ ব্যবস্থা পাঁচ প্রকারের:

১. বুনানউই লাইনউই হাবাহ্: বলপ্রয়োগ বা অপহরণের মাধ্যমে বিবাহ।
২. দুনখারনাই হাবাহ্: পালিয়ে বিয়ে।
৩. খারসোনাই হাবাহ্: কনের বরের বাড়িতে পালিয়ে আসা।
৪. গুর্জিয়া হাবাহ্:ঘরজামাই প্রথা।
৫. নায়নানউই লাইনাই হাবাহ্: পারিবারিকভাবে স্থির করা বিবাহ (দেখা-শোনা করে বিয়ে)।

ঐতিহ্যবাহী মেচ সমাজে পারিবারিকভাবে স্থির করা বিবাহই আদর্শ হিসেবে গণ্য হয়। বর্তমানে মেচ নারীদের বৈবাহিক অবস্থার চিহ্ন হিসেবে শাঁখা, পলা এবং সিঁদুরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যদিও প্রাচীনকালে এই ধরণের কোনো বিশেষ চিহ্ন ছিল না। মেচ সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ স্বীকৃত। যদি কোনো দম্পতি পারস্পরিক সম্মতিতে বিচ্ছেদ চান, তবে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে পান পাতা ছিঁড়ে সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। বিধবা বিবাহ সামাজিকভাবে স্বীকৃত হলেও এটি খুব কমই দেখা যায়। স্থানীয় পুরোহিত (Deury) জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের আচারগুলো সম্পন্ন করেন। মেচ সমাজে পাপীদের প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান রয়েছে। কৃষিকাজ, অন্নপ্রাশন বা নবান্নের মতো সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে দেবতাদের পূজা করা হয় এবং 'জাউ' পরিবেশন করা হয়। গৃহপালিত পশুর সেবার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মেচেরা 'গোরু উৎসব' পালন করে, যেখানে তারা গোরুর উদ্দেশ্যে ছড়া কাটে:

> "লাউ খাও, বেগুন খাও, বছরে বছরে বৃদ্ধি পাও। তোমার মা ও বাবার ওপর দিয়ে গিয়ে বড় বলদ হও। মায়ের মতো ছোট থেকো না, বাবার মতো বড় হও। বাগানের কোণের ব্যাঙের মতো তুমিও কি লম্বা আর চকচকে হবে?"[৪]

অনাদিকাল থেকে মেচেরা 'খেরাই' উৎসব পালন করে আসছে, যা তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন উৎসব। এটি মূলত কৃষিজীবী মেচদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উর্বরতার কামনায় করা একটি উৎসব। তারা বিশ্বাস করে যে বাথৌ দেবতাকে সন্তুষ্ট করলে তাদের ফসল ভালো হবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অশুভ শক্তি থেকে তারা রক্ষা পাবে। খেরাই উৎসবকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়: আই খেরাই, মারাই খেরাই এবং গাজা খেরাই।

এই উৎসবে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো থেকে বিপুল জনসমাগম ঘটে, বলা যেতে পারে যে প্রতিবেশীদের মধ্যে রুশো-বর্ণিত ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সংহতিকে আরও সুদৃঢ় করে তোলে। উত্তরবঙ্গে প্রকাশ্য জন-উপাসনার এই গৌরবময় ঐতিহ্য ক্রমশ ম্লান হতে থাকলেও, অসমের বিভিন্ন প্রান্তে এটি আজও এক জীবন্ত সংস্কৃতি। খেরাই ছাড়াও মেচ সমাজ নববর্ষের মতো উৎসব অত্যন্ত আনন্দের সাথে পালন করে। পহেলা বৈশাখ মেচ সমাজে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে— বিশ্বাস করা হয় যে, এই শুভ দিনেই 'বাথৌ' ধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল। এই ধর্মই মেচ সমাজে শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করেছে।

মেচ জনজাতির আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তনের প্রবাহ চললেও, বাথৌ ধর্মের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক গভীরতা তাঁদের মূল্যবোধ ও গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, শামুকতলার মেচেরা দেবী দুর্গার আরাধনা করেন, যাঁকে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব দেবী মাইনৌ-এর সমতুল্য মনে করেন। মেচদের একটি অংশ খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হলেও ইসলাম ধর্মের কোনো প্রভাব এই সমাজে নেই। ইতিহাসের পাতায় আলি মেচ নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি হোসেন শাহকে উত্তরবঙ্গ অভিযানে সাহায্য করেছিলেন; তবে এর ফলে মেচদের মধ্যে ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার কোনো বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মেচ সম্প্রদায়ের অন্যতম পথপ্রদর্শক কালীচরণ ব্রহ্মমেচ (যিনি 'গুরুদেব কালীচরণ ব্রহ্ম' এবং 'মেচ গান্ধী' নামে পরিচিত) স্বামী শিবনারায়ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 'ব্রাহ্মধর্ম' বা 'Baram' ধর্মের প্রবর্তন করেন।

রাজনৈতিকভাবে মেচ সম্প্রদায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও এই জনজাতির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম মেচ হিসেবে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম মন্ডল কালচিনি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। একই বছর বীরেন্দ্রনাথ কাঠাম জলপাইগুড়ি সংরক্ষিত আসন থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। সাম্প্রতিক সময়ে উইলসন চাম্প্রামারী কালচিনি কেন্দ্র থেকে দুই মেয়াদে বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে ভারতীয় রাজনীতির সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে মেচদের অংশগ্রহণ আনুপাতিক হারে কিছুটা কম হওয়ায় তাঁদের রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিকভাবে মেচেরা একসময় ঝুম চাষ, বুনন শিল্প, বনজ সম্পদ সংগ্রহ এবং শিকারের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। কালক্রমে প্রথাগত স্থানান্তর কৃষির পরিবর্তে তাঁরা স্থায়ী কৃষিকাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। বর্তমানে মেচেরা কৃষি, ব্যবসা এবং সরকারি চাকুরিসহ বিভিন্ন পেশায় সফলভাবে নিয়োজিত আছেন; তবে তাঁরা কখনোই 'বন্ধকী শ্রমিক (Bonded Labour) হিসেবে কাজ করেন না। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই জনজাতি এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

গবেষণালব্ধ ফলাফল ও উপসংহার:

বৃহত্তর বোরো-কাছারি জাতিগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে মেচ জনজাতি পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের ইতিহাস, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা এবং সহনশীলতার এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। ঐতিহাসিক ও নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে মেচদের উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ থাকলেও, ইন্দো-মঙ্গোলয়েড এবং বোরোদের সাথে তাঁদের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক অনস্বীকার্য। প্রতিকূল পরিবেশ এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তনের চাপে তাঁদের ভারতে প্রবেশের এই যাত্রা অভিবাসন, অভিযোজন এবং টিকে থাকার এক জটিল উপাখ্যান। তাঁদের নামকরণের নেপথ্যে থাকা নানা তত্ত্ব— সংস্কৃত 'ম্লেচ্ছ' শব্দ হোক বা মেচি নদীর ভৌগোলিক সম্পর্ক— এটিই প্রমাণ করে যে সংস্কৃতি ও পরিবেশ উভয়ই তাঁদের পরিচিতি গঠনে বড় ভূমিকা রেখেছে।

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে মেচেরা একটি সমতাভিত্তিক এবং পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনে চলেন, যেখানে বিভিন্ন 'গোত্র' বা গোষ্ঠী সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। তাঁদের সমৃদ্ধ মৌখিক ঐতিহ্য ও লোকগাথা আজ পূর্ব নাগরী লিপির মাধ্যমে বোরো সাহিত্যে এক নতুন প্রাণ পেয়েছে। এই ভাষাগত বিবর্তন অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির পাশাপাশি নিজেদের অনন্য ঐতিহ্য রক্ষার সংকল্পেরই প্রতীক।

ধর্ম আজও মেচদের জীবনের মূল ভিত্তি। তাঁদের প্রকৃতি-কেন্দ্রিক বিশ্বাস 'বাথৌ' ধর্ম বাস্তুসংস্থান এবং দর্শনের এক গভীর সমন্বয়। সিজৌ গাছের উপাসনা এবং মূর্তিপূজার অনুপস্থিতি বাথৌ ধর্মকে এক স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছে। হিন্দু ও নাথ ঐতিহ্যের প্রভাবে তাঁদের আচার-অনুষ্ঠান ও খেরাই উৎসবের মতো পার্বণগুলো সামাজিক সংহতি ও নৈতিক জীবনযাপনে সহায়তা করে। কালীচরণ ব্রহ্মের নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্মের সংস্কার এবং হিন্দুধর্মের সাথে সমন্বয়বাদী সম্পর্ক এটিই নির্দেশ করে যে, তাঁরা নিজেদের মূল ভিত্তি হারানো ছাড়াই আধুনিকতাকে গ্রহণ করতে সক্ষম।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে মেচেরা বনজ জীবিকা ও ঝুম চাষ থেকে সরে এসে স্থায়ী কৃষি ও শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেছেন। তফশিলি উপজাতি হিসেবে নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রান্তিকতা সত্ত্বেও, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আঞ্চলিক রাজনীতিতে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁদের বিবাহ রীতি, খাদ্যাভ্যাস এবং ভেষজ চিকিৎসা বিদ্যা একটি ব্যবহারিক ও নীতিবোধসম্পন্ন বিশ্ববীক্ষার পরিচয় দেয়, যেখানে ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং গোষ্ঠীগত মূল্যবোধের এক চমৎকার ভারসাম্য রয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের টিকে থাকা এবং অভিযোজনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো মেচ জনজাতি। তাঁদের সমৃদ্ধ ইতিহাস, ভাষাগত ঐতিহ্য এবং আধ্যাত্মিক গভীরতা কেবল এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকেই সমৃদ্ধ করেনি, বরং প্রকৃতি ও সম্প্রদায়ের সাথে মানুষের সম্পর্কের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। আধুনিকতার এই যুগে মেচ সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও চর্চা করা একান্ত প্রয়োজন, যাতে এই অনন্য কণ্ঠস্বর ও উত্তরাধিকার আগামী প্রজন্মের জন্য চিরকাল অম্লান থাকে। তাঁদের এই কাহিনী কেবল টিকে থাকার লড়াই নয়, বরং এক রূপান্তর ও আশার গল্প— যা ভারতের বিচিত্র জাতিগত ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

তথ্যসূত্র:

১. ব্রহ্ম, শেখর। রিলিজিয়ন অফ দ্য বোরোস অ্যান্ড দেয়ার সোশিও-কালচারাল ট্রানজিশন: আ হিস্টোরিক্যাল পারসপেক্টিভ। গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৫, পৃ. ৩১।

২. ঘোষ, রঞ্জন। ইমাজিনেশন, ইমেজিং, অ্যান্ড রিভিশনিস্ট এসথেটিকস ইন রুশদি'স হারুন অ্যান্ড দ্য সি অফ স্টোরিজ: অ্যান (ইন)ফিউশনিস্ট অ্যাপ্রোচ। পেন স্টেট ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০২৩, পৃ. ১১।

৩. দত্ত, সৃষ্টি বি। এক্সপ্লেনড: হোয়াট ইজ বাথৌ, দ্য রিলিজিয়ন অফ দ্য বোরোস ইন আসাম। ব্যাক2রুটস, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

৪. মণ্ডল, পার্থ সারথী এবং তনুশ্রী ভৌমিক। লিটারেচার অ্যাজ আ মিরর: রিফ্লেক্টিং মেচ কালচারাল আইডেন্টিটি অ্যান্ড হেরিটেজ। দ্য লিটারারি হেরাল্ড, খণ্ড ১১, সংখ্যা ৩, অক্টোবর ২০২৫, পৃ. ২০১।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. অসম কালচারাল ইনস্টিটিউট। ফোকলোর অ্যান্ড ওরাল ট্র্যাডিশনস অফ মেচ অ্যান্ড লিম্বু। ২০১৮।

২. ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ। এথনো-হিস্টোরিক্যাল অ্যাকাউন্টস অফ দ্য বোরো-কাছারি ট্রাইবস। ২০১৫।

৩. ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ রিলিজিয়াস স্টাডিজ। খেরাই ফেস্টিভ্যাল অ্যান্ড রিচুয়ালস অফ মেচ ট্রাইব। ২০১৮।

৪. ইন্ডিয়ান অ্যানথ্রোপোলজি আর্কাইভস। সোশ্যাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস কাস্টমস অফ দ্য মেচ ট্রাইব। ২০১০।

৫. ইস্টার্ন হিমালয়ান স্টাডিজ জার্নাল। মাইগ্রেশন প্যাটার্নস অফ বোরো-কাছারি ট্রাইবস। ২০১৫।

৬. উইস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভস। পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অফ মেচ লিডারস ইন পোস্ট-ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিয়া। ১৯৫২–২০১০।

৭. উলফেনডেন, এস. এন। নোট অন দ্য ট্রাইবাল নেম ‘মেস’ (মেচ)। জার্নাল অফ দ্য রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৩৫।

৮. ওহ্লমেন্স, মেরি অ্যান গিলিস। হেনরি বার্গসঁ অ্যান্ড ব্রিটিশ মডার্নিজম। এমকিউইউপি (MQUP), ১৯৯৬।

৯. কালীচরণ ব্রহ্ম। সোশ্যাল রিফর্ম অ্যান্ড ব্রাহ্ম ধর্ম মুভমেন্ট এমং দ্য মেচ কমিউনিটি। ১৯৫০।

১০. কুমার, রাজেশ। রিলিজিয়াস সিনক্রিটিজম এমং বোরো-কাছারি ট্রাইবস। ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ কালচারাল অ্যানথ্রোপোলজি, ২০২২।

১১. গৃহস্থালয় ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার। সেনসাস রিপোর্ট। ১৯৮১–২০২৪।

১২. গ্রিয়ারসন, জর্জ এ। লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। খণ্ড ৪, ১৯০৩।

১৩. গোস্বামী, প্রিয়াঙ্কা। ইউজ অফ জাউ রাইস বিয়ার ইন ট্র্যাডিশনাল মেডিসিনাল প্র্যাকটিস। জার্নাল অফ ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন, ২০২৩।

১৪. ঘোষ, রঞ্জন। ইমাজিনেশন, ইমেজিং, অ্যান্ড রিভিশনিস্ট এসথেটিকস ইন রুশদি’স হারুন অ্যান্ড দ্য সি অফ স্টোরিজ: অ্যান (ইন)ফিউশনিস্ট অ্যাপ্রোচ। পেন স্টেট ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০২৩।

১৫. চন্দ, রমাপ্রাসাদ। হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা প্রেস, ১৯২০।

১৬. চৌধুরী, পি. সি। দ্য বোরোস: দেয়ার অরিজিন, হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার। গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি, ১৯৯০।

১৭. জশি, অঞ্জলি। ফোকটেলস অ্যান্ড মাইথোলজি কালেকশন অফ মেচ ট্রাইব। ফোকলোর টুডে, ২০২০।

১৮. জার্নাল অফ এথনোগ্রাফিক রিসার্চ। গোত্র সিস্টেমস এমং দ্য মেচ ট্রাইব। ২০২০।

১৯. তালুকদার, উজ্জ্বল কুমার। অন হিস্ট্রি অফ দ্য মেচ কাচারিস অফ আসাম। অ্যান্ট্রোকম জার্নাল, খণ্ড ১৯, সংখ্যা ১, জুন ২০২৪।

২০. দত্ত, সৃষ্টি বি। এক্সপ্লেনড: হোয়াট ইজ বাথৌ, দ্য রিলিজিয়ন অফ দ্য বোরোস ইন আসাম। ব্যাক2রুটস, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

২১. দাস, বিপুল। ইমপ্যাক্ট অফ পপুলেশন এক্সপ্লোশন অন ইকোনমি অফ মেচ ট্রাইব। ইকোনমিক অ্যান্ড ডেমোগ্রাফিক স্টাডিজ, ২০১৮।

২২. দাস, মঞ্জু। ম্যারেজ সিস্টেমস অ্যান্ড সোশ্যাল নর্মস ইন মেচ কমিউনিটি। সোসিওলজিক্যাল পারসপেক্টিভস, ২০১৬।

২৩. ডেকা, জিতেন। পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন অফ শিডিউলড ট্রাইবস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, ২০১৯।

২৪. দেব, সন্তোষ। হারবাল নলেজ সিস্টেমস অফ নর্থ বেঙ্গল ট্রাইবস। জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান বোটানি, ২০২১।

২৫. নগেন্দ্রনাথ বসু। হিস্টোরিক্যাল অ্যান্ড এথনোলজিক্যাল স্টাডিজ অফ আসাম অ্যান্ড বেঙ্গল। ১৯২২।

২৬. নর্থইস্ট ইন্ডিয়া হিস্টোরিক্যাল রিভিউ। রোল অফ মেচ ট্রাইব ইন ইন্ডিয়াজ ফ্রিডম স্ট্রাগল। ২০২০।

২৭. পাঠক, অনিল। ইনফ্লুয়েন্স অফ ব্রাহ্ম ধর্ম অন মেচ সোসাইটি। জার্নাল অফ রিলিজিয়াস রিফর্ম, ২০১৯।

২৮. বোরো সাহিত্য সভা পাবলিকেশনস। বোরো লিটারেচার অ্যান্ড স্ক্রিপ্ট ডেভেলপমেন্ট। ২০২৩।

২৯. বোরো লিটারেচার বোর্ড। মেচ স্ক্রিপ্ট ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ রিপোর্টস। ২০২৩।

৩০. বোরো-কাছারি কালচারাল ফাউন্ডেশন। ডকুমেন্টেশন অন বোরো-কাছারি ফেস্টিভ্যালস অ্যান্ড সোশ্যাল কাস্টমস। ২০২১।